Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# জীবনানন্দের মিথচেতনার স্বরূপ-সূত্র

| | |
|---|---|
| Volume | 40 |
| Issue | 2 |
| Year | 1997 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | বেগম আকতার কামাল |
| Published online | February 1, 1996 |
| DOI | 10.62328/sp.v40i2.2 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.2 |
| Pages | 21-32 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# জীবনানন্দের মিথচেতনার স্বরূপ-সূত্র

বেগম আকতার কামাল

'চেতনা' শব্দটি মননক্রিয়া ও জ্ঞান-নির্দেশক হলেও কবির চেতনা স্বতন্ত্র, স্বত:স্ফূর্ত নান্দনিক সংবেদনলব্ধ প্রজ্ঞান; শিল্পসৃষ্টির আবেগই হল তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা— মনন তার একটি মাত্রা মাত্র। মানববুদ্ধি বিকাশের সূচনালগ্নেই জেগেছিল মননের ক্রিয়াবৃত্তি— বস্তুবিশ্বচেতন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এর বিবর্তন ঘটে থাকে। মিথসৃষ্টির কালে আদিমানুষ তার বিস্ময়মিশ্র কল্পনা ও চিন্তার একটি ধরন খুঁজে নিয়েছিল, যা দিয়ে সার্বভৌম ধারণার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য করে নিত বস্তুবিশ্বের ব্যাখ্যা-ঘটনা, মন ও প্রবৃত্তির রহস্যময়তা এবং ঐ ধরনই তাদের সূত্রবদ্ধ করে দিত কিছু স্বত:সিদ্ধ বিধানের সঙ্গে, একীভূত করে রাখত সম্মিলিত মানব প্রজাতির সঙ্গে এবং সংজ্ঞায়িত করত ব্যক্তি ও বস্তুকে। বস্তুরূপের মধ্যে কল্পনার বিশাল মূর্তজগৎ রচনার ক্ষমতাও তারা অর্জন করেছিল, মিথকাঠামো যার ধারক। অনুরূপ দৃষ্টিক্ষমতার চর্চায় আজও আমাদের মনন চিন্তা করে, বস্তু-অভিজ্ঞতাকে দেয় কল্পমূর্তির সত্যতা, যদিও আমরা সহজ বিশ্বাসের সারল্য থেকে চ্যুত হয়েছি। আদি শৈশবের বিমূঢ়-চিত্ত, বিহ্বল-ভাবময়তা সভ্যতার জটিল বাঁক পেরিয়ে এখন তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক ও স্বাধীন, বিমূর্ত কল্পনার উচ্চস্তরে আমাদের ইন্দ্রিয় বিকচ ও উত্তীর্ণ, আমাদের প্রকাশক্ষমতাও অনুসূক্ষ্ম এবং ব্যক্তিক। একালের মানুষের মিথচেতন-বৃত্তিটি মূর্তকেই করে বিমূর্ত, বহুস্তরবিশিষ্ট চৈতন্যের সঙ্গে তার নিত্যবসবাস। আজকের কালপরিধির মানুষ পেয়েছে চিত্তের প্রকাশ ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং মূলত বিজ্ঞান-দৃষ্টি। এসবের প্রণোদনায় বেড়েছে দেশকালের পরিসর ও সৃষ্টি হয়েছে ঘটনার বহু-আয়তনিক তাৎপর্য, বিশ্বজগতের ব্যাপ্ত-দৃষ্টিলোকের মধ্যে তার সঞ্চরণ উন্মুক্ত ও অবাধ, বিশেষ কোন একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধানের প্রতি অন্ধ দায়বদ্ধতা তার নেই, গোষ্ঠিগতভাবে সম্মতি প্রদানের বৈকল্য থেকেও ঘটেছে তার মুক্তি। কিন্তু পরিবর্তে আরও এক অদৃশ্য বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ ও বিধানের বেষ্টনী এখন মানুষকে ঘিরে আছে। মিথ-বিনির্মাণ এখন আরও গভীরতর তাৎপর্যে বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত।

শিল্পরূপের প্রযুক্তি হিসেবে মিথ-উৎস ও উপাদানের ব্যবহার বা কবিমানসে এর প্রভাব-সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাখ্যাও ভিন্ন হতে বাধ্য; জীবনসূত্র বিশ্লেষণের নব-নব দৃষ্টিকোণে তার পরিবর্তন নিরন্তর। কবিতার বিবর্তন আরও এক গতিশীল প্রবাহ, অথচ মিথ অনড়, অপরিবর্তনীয় উৎস-আকর। দুইয়ের স্বরূপ ও চলমানতা বিপ্রতীপগতির ও স্বয়ম্ভর হয়েও অন্যোন্য, উভয়কে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে কবিকে গড়ে নিতে হয় প্রথমেই আত্মময়, স্বতন্ত্র আবেদনের পরিমন্ডল অর্থাৎ মিথচেতন কবির মনোজগৎ নিভৃত, ব্যক্তিক, রূপকচ্ছিন্ন, অযৌথ ও প্রতীকী চিত্রকল্পাত্মক। আরও জটিল রসায়নে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য, তাঁর জীবনকালের বস্তুজগৎভিত্তিক চিন্তন-পদ্ধতি এবং চিরকালীন কিছু মানবপ্রত্যয় -সম্পর্কিত যুগোচিত নতুন জিজ্ঞাসা। ফলে মিথচেতনার ক্ষেত্রেই সম্ভরপর হয় উক্ত সকল প্রতিশ্রুতির অভিযোজন-ক্রিয়া। প্রশ্ন জাগে, এক্ষেত্রে প্রথমে মিথের আদিরূপ কী ভাবে বর্তমানের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে, মিথকে মূলরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অধুনার বৃন্তে কতখানি প্রস্ফুটিত করা সম্ভব! সময়প্রবাহের খন্ড-খন্ড সীমার মধ্যে লালিত আমাদের শ্রেয়োবোধ, সংগুপ্ত স্বপ্ন, মহৎ মানবীয়তা আর সৃজনক্ষম-প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা মিথের আদি, মৌল বন্ধরূপের বৃত্তে কী ভাবে হতে পারে পুন:প্রজ্বলিত!

যে-কোন কালের কবি মিথযুগের চিত্তধর্ম নিজচৈতন্যে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে মিথচেতন হতে পারেন। এ-জাগরণে বিস্ময়করভাবে পুষ্পিত হয়ে যেতে পারে নির্জ্ঞান-মনে লুক্কায়িত দেশজ-বৈশ্বিক সংস্কৃতির একক, অনাদি এক বিরাট মহীরূহ। এ-লক্ষ্যে কবি বর্তমানের উষ্ণস্রোত বাহিত করেন আদিশৈশবে সৃষ্ট মিথের হিমবাহের শরীরে, অবশ্য, মিথকথানুযায়ী ধারাস্রোতটি বর্তমানের হয় না, তা সর্বদাই চিরায়ত, কালহীন, অনন্ত সময়-উৎস থেকে উৎসারিত।

কবি প্রথমে ব্যক্তিগত শিল্পবাসনাকে জাগতিক প্রজ্ঞার অগ্নিতে প্রজ্বলিত করেন, যেন তিনি মিথরচনাকালীন যৌথ-মানবচিত্তের বাসনায় পরিস্নাত হচ্ছেন, ভেঙে ফেলেন মিথের প্রাথমিক অন্তর্যুক্তির বদ্ধগ্রন্থি, জ্যামিতিক আয়তন, সারমর্ম— প্রাথমিক যেসব বদ্ধতায় তৈরি হয়েছিল প্রতীতির অনড় কাঠামো, তাৎপর্যের রূপক, বিধানের শক্তি। ভাঙনের পরবর্তী পর্যায়ে কবি রচনা করেন ব্যবধানের দেয়াল, যদিও ঐসব প্রত্নবাসনা দিয়েই তিনি তাঁর তাৎক্ষণিক অনুভূতির পরিচয় লাভ করেন, প্রকাশযোগ্য বস্তুরূপকে খুঁজে নেন, ঘটনা-অনুভবকে মিলিয়ে নেন মিথঘটনার অন্ত:সারের সঙ্গে। ফলে সৃষ্টি হয় এক নতুন বন্ধনরূপ— একালের

সঙ্গে চিরায়ত অস্তিত্বের অংশধারা এসে সম্মিলিত হয়, এ-সময়কার ভগ্ন-চূর্ণপ্রায় জীবনযাপন, নৈঃসঙ্গ্য, বেদনা, পরাভবের যন্ত্রণা মিথের স্মৃতিপুঞ্জে খুঁজে নেয় স্বরূপ ও নির্ভরতা। মিথ কবিকে দেয় এমন এক সক্রিয়তার শক্তি ও মূর্ততার আস্বাদ যা বস্তু ও কল্পনার নৈকট্যকে গূঢ়তর-সম্বন্ধ প্রদানে সমর্থ, অন্তত আদিযুগে মিথ এমন সামর্থ্য বহন করত, বস্তুর সঙ্গে তখন কল্পনা ছিল অভিন্ন, একমাত্রিক। মিথের স্মৃতি, ভগ্নাংশ বা বিবর্তিত-অবয়ব, প্রতিমার মধ্যে ব্যক্তিমন নিজ-অভিজ্ঞতার সমান্তরাল বিশ্ব সন্ধান করে ও নতুন মাত্রা গড়ে।

মিথচেতনার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের নেপথ্য দায় বহন করে আমাদেরই নির্জ্ঞান-মন; সবরকম যুক্তি ও বিজ্ঞানদৃষ্টির বাইরের স্তরে এ-মনের অস্তিত্ব ও বিচরণ, এর রয়েছে নমনীয়তা ও সংলগ্ন-হওয়ার অশেষ ক্ষমতা— যে-কোন অনুভূতিতে, ঘটনাংশের সঙ্গে। আমাদের জীবনবিশ্বাসের অনেকাংশ মিথের সঙ্গে যে-কোন আয়তনে ও তাৎপর্যে জড়িয়ে থাকে। গোষ্ঠিমানসের সঙ্গে মিথের যেসব অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্র ছিল, তার বিচ্যুতিতে কবি নতুন করে তা সম্বন্ধ-বদ্ধ করেন, দূরাতীত, বিচ্ছিন্নপ্রায় ব্যক্তিমনসমূহের বা বহুমানবের একক মনের জমাটবদ্ধ উৎস-রূপের মধ্যে কবির ব্যক্তি মন প্রত্যাবর্তিত হয়। এ যেন এক অবিনশ্বর আকর— যা ব্যক্তিমনকে বিচিত্র শুশ্রূষায় সুস্থ করে— যদিও জটিল জীবনমানের তারতম্যে, দেশকাল-সমাজভেদে, ব্যক্তির পৃথকতায় মিথ পূর্বতন তাৎপর্য নিয়ে আর কোন উপযোগিতা বহন করে না। তবু, কবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ বিবেচনার সূত্রে কোথাও কোথাও উপযোগিতার প্রয়োজন বহুমাত্রিক— হয়ত তা নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক অথবা ভাষাগত উপযোগ, কিংবা সবকিছুর সমাবেশে উদ্ভূত বিচিত্র সম্পর্কের নান্দনিক প্রয়োজনীয়তা। বর্তমানে কবিতায় মিথ-ব্যবহার জীবনে তার বাস্তব, মূর্ত প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অবশ্য জনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও মিথের অস্তিত্ব জাগরূক, ধর্মমাহাত্ম্য কথায়, উপকথায়-রূপকথায়, কিংবদন্তীরূপে, রূপকে-প্রতীকে-উপমায় মিথগুলো পূর্ব-সম্বন্ধ নিয়ে রয়েই যায়। আধুনিক-পূর্ব বাংলা কবিতার জগতে রয়েছে সেসব মিথের বিপুল উপাদান-সম্ভার, প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে মিথ ও জীবন, বাস্তবতা ও কল্পনাবৃত্তি, কবি ও পাঠকচিত্ত সেখানে ছিল অপৃথকীভূত, সমষ্টিচৈতন্যের মধ্যে দ্রবীভূত। মিথ প্রসঙ্গে যে কবির চেতনা প্রথম আধুনিক অর্থে স্বাতন্ত্র্য-সূত্র তৈরি করে, তিনি কবি মধুসূদন। তিনি মিথকে করে তোলেন পরিবর্তিত-রূপের সম্বন্ধযুক্ত, আত্মপ্রতিকৃতির পটভূমি ও প্রতীক।

প্রসঙ্গত বাংলা কবিতার অন্তর্বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুটি সরলীকরণ-সূত্র মেনে নিতে হয়। এক. বাংলা কবিতা আত্মতার প্রকাশ-সমস্যায় পীড়িত, চর্যাপদের অধ্যাত্ম-রূপক বা মধ্যযুগীয় গোষ্ঠিপ্রীতির প্রবলতা সত্ত্বেও আত্মতাই কবিতার আরাধ্য বিষয়, এর সঙ্গে সমাজমানসের দ্বন্দ্বজটিল টানাপোড়েন খুবই তীব্র। দুই. প্রথম সূত্র থেকে এ-তথ্য উন্মোচিত হয় যে, আমাদের কবিতার প্রাণশক্তি নিহিত ছোট ছোট লিরিক-রূপের মধ্যে। লিরিকের সহজ প্রকাশ ও সীমাই কবিতার মূল-অবয়ব— মহাকাব্যিক আত্মা বা কাঠামো এর প্রার্থনা নয়।

তিরিশের কবিদের মিথচেতনার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় দুটি প্রবাহ, এক. মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রবর্তিত ভারতীয় ধারা, দুই. ইউরো-আধুনিক শিল্পচিন্তার রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত প্রকরণ হিসেবে মিথ-উৎসের ব্যবহার। যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত বিকাশ ও অতিস্ফীতি, সংস্কৃতির তারতম্য ও একপেশে বৃদ্ধি— যা মানুষের নিঃশর্ত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক, তার দ্বারা জীবন হয় প্রতিমুহূর্তে নি:সহায়, অদৃশ্যশক্তির বা নিয়তির মত কোন এক পরাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত, নিজ অস্তিত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মানুষ হয় আরও বেশি সচেতন। অথচ মনুষ্যকীর্তি ও ক্ষমতার বিপুল ঐশ্বর্য চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, মানুষের জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার অপরিমিত সম্ভাবনায় ও সম্ভারে বসুন্ধরা উপচীয়মান।

পাশাপাশি শূন্যতাবোধে-বিপ্রতীপ চেতনায় ব্যক্তি ক্রমাগত হচ্ছে সন্ত্রস্ত, নিরবলম্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর্যায় থেকে ব্যক্তির এই সংকট তীব্র হচ্ছিল; সমাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি, মূল্যবোধের পচন ও ভ্রান্তি, প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য, রাষ্ট্রনীতির বিপর্যয় ব্যক্তিকে ঠেলে দেয় গভীর অনিশ্চয়তায়, কিন্তু বৈপরীত্য দূর করাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির সূচক। দ্বন্দ্বময় এসব সংকটকে স্বপ্নভঙ্গের আর্তির সঙ্গে বিজড়িত করে মানুষ একভাবে আবারও হচ্ছে মিথচেতন। শুধু আর মিথ-উপাদানের আলঙ্কারিক ব্যবহার নয়, এই চেতনার সীমা বহুদূরে বিস্তৃত, জ্ঞানবিজ্ঞানের তথা অবকাঠামো-উপরিকাঠামোর মূলীভূত সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্যে প্রসারিত। মিথলজির চর্চা একে আরও ব্যাপকতা দেয় নব-নব দিগন্ত যুক্ত করার মধ্য দিয়ে। বর্তমানকে অতীতের সদৃশ বহু প্রত্যয়ের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে সভ্যতার উষাকালকে অনুধাবনের প্রচেষ্টাও এর অন্তর্গত, ভবিষ্যতের তাৎপর্য সৃষ্টির সূত্রও এখানে অনুসন্ধেয়। তাছাড়া, চৈতন্য ও তার চারপাশের অবোধ্য বস্তুজগৎকে বোঝার প্রয়াসেও চলে মিথিক্যাল-পদ্ধতির পরিচর্যা। বিশেষত, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব— এসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মিথপ্রতিমা ও অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য

দিয়ে কার্যকর হয়ে ওঠে বর্তমানতার স্বরূপ উদঘাটনের রহস্যসূত্র। ইয়েটস-পাউন্ড-এলিয়ট, তাঁদের কাব্যাঙ্গিকে মিথকে গ্রহণ করেন জীবন ও সভ্যতার বিশৃঙ্খলা-ক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ক্ষণভঙ্গুর, মুমূর্ষু তাৎক্ষণিক অবস্থাদির প্রতিপক্ষরূপে চিরায়তকে বাঁধবার আন্তর্তাগিদেই ঐতিহ্যিক প্রতীকসমূহ অনিবার্য হয়— যেন শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্বকে করা যায় পুনর্গঠিত, পাওয়া যায় স্থিরতার বিন্দু, আবেগের উৎসমুখ। স্থিরকাল-বদ্ধ মিথানুষঙ্গ ও তার বিন্যাস দিয়ে কবিরা পুনর্নির্মাণ করতে চান সভ্যতায় ভেঙ্গে-পড়া সৌধ।

মিথের অভ্যন্তরে রয়েছে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বসৃষ্টি ও দ্বন্দ্বধারণের নমনীয় স্থিতিস্থাপক-শক্তি, আবার একই সঙ্গে আছে দ্বন্দ্বোত্তরণের দিকচিহ্ন। আদি মানবের কাছে এগুলো মূল্যবহ হত দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ-ক্ষমতার জন্যই, কিন্তু বিশ শতকে এ-জাতীয় বাস্তব নিদানতত্ত্ব হিসেবে মিথ গ্রাহ্য হতে পারে না। আদিকালে মিথ অপৃথকীভূত থাকায়, যৌথ-আবেগযুক্ত হওয়ায় জীবনের সঙ্গে এর একটি সত্যবন্ধন ছিল, একাল বহুখন্ডিত, পৃথকীভূত, বিচূর্ণ এবং আপেক্ষিক। পুরাকালে মানবমন অখন্ডভাবে মিথকে প্রতীতির মধ্যে ধারণ করত, এখন অনুরূপভাবে আমাদের চেতনা বিশেষ একটি প্রতীতির মধ্যে একাগ্রচিত্ত থাকেনা। তবু, মনের খন্ডায়নে-সংশয়ে-শূন্যতায় মিথই হয়ে উঠতে চায় অখণ্ডতার স্মারক, যা উপস্থাপন করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কল্পনাকুসুমগুলোর অস্তিত্ব। মিথের রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনী-শক্তি, আত্মদ্বন্দ্ব মুক্তিরও নিদান, রয়েছে যুক্তির পরপারস্থিত মনোজগতের গোপন রন্ধ্রপথ উদঘাটনের প্রক্রিয়া, মিথ চেতনাকে বিরুদ্ধ বিশ্বের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। নন্দনতত্ত্বে মিথের এসব মাত্রাই আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, চেতনায় এর অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা হয় জটিল উৎসারণ হিসেবে। তিরিশের কবিদের চেতনায় মিথতত্ত্বের উন্মোচন-সূত্র বিবেচ্য হতে পারে মিথকে চেতনার কনসেপ্ট হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সংযোগ-তথ্য আবিষ্কার করে।

জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটসের সাযুজ্য-নির্দেশ মিথের সূত্রেই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়। ইয়েটস আমাদের স্মৃতিকে বিপুল-স্মৃতির আর চিত্তকে বৃহৎমনের অংশস্বরূপ ভাবতেন। বহুমানবের মন একের মধ্যে সঞ্চার করে লভ্য হয় একীভূত শক্তি, ফলস্বরূপ উপলব্ধ হয় ঐ বৃহৎ একীভূত শক্তি হল স্বয়ং প্রকৃতিবিশ্ব। বৃহৎস্মৃতি আর বিপুল-চিত্ত কেবল জাগ্রত হতে পারে প্রতীকের মাধ্যমে এবং সেই প্রতীকী-শক্তি রয়েছে মিথের মধ্যে। ইয়েটসের প্রত্নপুরুষ-মগ্নস্মৃতির এই ভাবনার ক্ষেত্রে প্রভাব

বিস্তার করেছিল সে-সময়কার নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলি, বিশেষত, ফ্রেজারের আদিজাতির মিথ-সংগ্রহ, য়ুং-এর কালেকটিভ আনকনশাস, আইরিশ লোকপুরাণ ইয়েটসকে দিয়েছে প্রত্নস্মৃতির বিচিত্র, সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার।

জীবনানন্দের মিথচেতনার প্রথম সূত্র প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণের ভিন্নধর্মী অবলোকন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার মধ্যে যেভাবে তাঁর অধিষ্ঠাতা-আবেগশক্তি সন্ধান করেছে সৌন্দর্য-আনন্দ ও পরমতত্ত্বের উৎস বৈচিত্র্য-পরিণাম, তিরিশের কবি সেভাবে আবেগপোষণ করেন না, তারা প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার স্তরবহুল-মাত্রা নিয়ে ব্যথিত, আর্ত, বেপথু। ব্যতিক্রম হলেন জীবনানন্দ, আর্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাদের ধারণাগত প্রকৃতির রঙ-আলো-দৃশ্য বদলে দেন, সৃষ্টি করেন মনোলোকের মধ্যে বিস্মিত এক পরাপৃথিবীর প্রকৃতি, যে-পৃথিবীকে ইন্দ্রিয়বোধ দিয়ে আবার বাইরের প্রকৃতিপটেই করা যেতে পারে চিত্ররূপময়, বস্তুগতভাবে সুসঙ্গত। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নৈরাশ্যভাবে তাঁর ক্লান্তি-নৈ:সঙ্গ্য 'রঙের মধ্যে খেলা করে', ব্যক্তি হিসেবে তিনি আত্মমগ্ন-স্বভাবী এক পদাতিক, বেদনাবহ পথহাঁটাই তাঁর নিয়তি এবং যাত্রাপথটি তিমির গভীরতার মধ্যে ক্রমেই অতলান্তিক। কিন্তু জীবনানন্দ অন্তরসঙ্গী করেন আদিমানুষের মত পথযাত্রার বিস্ময়-ভয়-বেদনামিশ্র বোধকে, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান মানুষের নি:সহায় রূপটি তিনি চৈতন্যে বহন করেন, অনুভূতিতে সঞ্জীবিত রাখেন এর অপরিমেয় অনুপুঙ্খ প্রাণপ্রবাহের সৌন্দর্য, এর সূক্ষ্মতম স্পন্দন, চক্রক্রম। মৃত্যু-জন্ম-প্রেম-সময়-নারী— সব বিষয়ের কেন্দ্রেই প্রকৃতির অপ্রতিহত প্রভাব, অবলীন স্পর্শ। আদিমানবের চিত্ত শিহরণ-বিস্ময়-বিহ্বল-বিমূঢ়বোধে তাড়িত হত সম্মিলিতভাবে— কেননা প্রকৃতি তখন ছিল অনেকবেশি দুর্বোধ্য, অনায়ত্ত; তিনি যেন তাদেরই মত অনুভব করেন প্রকৃতির অমোঘসত্তা, তার নি:শব্দ-সঞ্চরণ, তবে এক্ষেত্রে তিনি একা, স্বতন্ত্র, ভিন্ন অনুভবে দীক্ষিত। 'রূপসী বাংলা'র বিস্ময়কর প্রকৃতি-দর্শনের মধ্যে একালের প্রজ্ঞা ও অন্তর্লোক বিম্বিত, কিন্তু মিথচেতন দৃষ্টিলোক থেকে এর উৎসারণ ঘটে— মিথপ্রতিমা ও অনুষঙ্গের পটে বাংলার বহমান প্রকৃতির অবিনশ্বর সংযোগকে সংবদ্ধ করেন জীবনানন্দ। মিথলোকের মতই মানব-প্রাণী-অবপ্রাণী-বৃক্ষলতা-আকাশলোক এবং জড়জগৎ এখানে একীভূত, পরম্পরিত হয়ে স্পন্দিত। ইতিহাস ছাড়িয়ে প্রত্নস্মৃতির ইন্দ্রিয়বেদ্য জাগরণ অভিভূত ও গ্রস্ত করে রাখে বিংশশতাব্দীর জটিল জীবনভারে-পীড়িত মনোবিশ্বকে, আমাদের অনুভব ঐকাত্ম্য বোধ করে মিথপ্রতিমার গর্ভস্থ

প্রাক্তন চিত্তের দ্বারা লালিত সব আবেগের সঙ্গে। তিনি এমন এক মায়াময় মিথকাঠামো অবলম্বন করেন যেখানে মানব নয়, মানব-প্রকৃতিই অনুধ্যেয় ও সত্য, যেন কোন এক নক্ষত্র লোকবিহারী- সত্তা পৃথিবীর পথে স্খলিত হয়ে প্রকৃতির প্রাণপ্রেতির স্পর্শে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনপ্রবাহ এবং ক্রমে কালচক্র বিজড়িত করে কবি প্রাণচক্রের সূত্র নির্মাণ করেন।

মৃত্যু-লীলার মধ্যে জীবনচক্র আবিষ্কার-লক্ষ্যে মৃত্যুর অমোঘতা সত্ত্বেও অমরত্বের প্রার্থনায় মিথচরিত্রগুলো ছিল উদ্বেলিত, ধ্বস্ত পৃথিবীর ধূসর-পটে জীবনানন্দও তাঁর মহাপৃথিবী রচনায় তথাকথিত রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি ইত্যাদি নির্দেশিত পন্থায় বিশ্বস্ত থাকেন না। তিনি শুধু ব্যবহার করেন মিথের অন্তর্লীন স্তরীভূত, বর্ণময় শাশ্বত কিছু স্মৃতি, প্রকৃতির মধ্যে খোঁজেন সেই স্মৃতির 'বস্তুসঙ্গতি'র শর্তাবলি। তাঁর কবিতায় জল আর নক্ষত্র, সমুদ্র ও পাখি, নারী ও বৃক্ষ, ঘাস ও চিল, আলো ও তিমির ব্যবহৃত হয় বাস্তবের প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে নয়, যেন সৃষ্টিলগ্নকাল থেকে বহমান কোন স্মৃতি-শক্তি-সৌন্দর্য-বেদনার ধারাবাহিকতা থেকে ঘটে এসবের উত্থান। তাই বস্তুজগতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেও কবির পৃথিবী হয় ঐ ধারাবাহিকতায় রহস্যময়, কুহেলিকাচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতন। মিথ ও প্রকৃতি অন্যোন্য সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে বলেই অবপ্রাণীসহ জড়জগৎটি আমাদের পরাচৈতন্যেই কেবল বাঙ্ময় হয়ে ওঠে— এই চৈতন্যের সূক্ষ্ম-চর্চা ব্যতীত তাঁর কবিতার পরিমণ্ডলে বিচরণ সম্ভব হয় না। প্রাত্যহিক পৃথিবী এখানে তাই 'মায়াবীর নদীর পারের দেশ'— কবি দূরাতীত স্মৃতিলোকে দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীকে দেখেন। জড় ও প্রাণের বিস্ময়কর সঙ্গম এখানে অব্যাহত, নিরবচ্ছিন্ন অথচ একই সঙ্গে মৃত্যুর দ্বারা অধিগত। জীবনানন্দ মিথের সঙ্গে দূরত্বের তাৎপর্য সৃষ্টি করেন মৃত্যুকে প্রগাঢ়ভাবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, গভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়ে, সভ্যতার কালখণ্ডে আবৃত তিমিরকে নিজচৈতন্যে ধারণ করে। এ-যেন দণ্ডিত, সংকটগ্রস্ত মানবাত্মার বিপর্যয়কাল, মানুষের অস্তিত্বের অভিশাপ-ভোগের যন্ত্রণা— মিথে যন্ত্রণাগ্রস্ত, অভিশাপ-দণ্ডিত আত্মার নানা রূপক বিদ্যমান। কিন্তু জীবনানন্দ জীবন ও মৃত্যুর সমরূপের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে সৃষ্টি করেন গভীরতর বেদনার অনিঃশেষ আনন্দময়তা, ক্ষয়ের ধূসরতার মধ্যে সৌন্দর্যের অবিরল নিঃসরণ। বেদনা ও মৃত্যুর প্রতি প্রগাঢ় মমতা-আকর্ষণ জাগিয়ে তোলার বিশেষ ক্ষমতায় তাঁর কবিতা চিত্রময়, অভিনব, প্রগাঢ়-আবেদনে ঋদ্ধ।

জীবনানন্দের ব্যক্তিস্বভাবে 'আমি'র উপস্থিতি প্রবলভাবে প্রাতিস্বিক, তীব্রবেদনা ও সুগভীর নিঃসঙ্গতা তাঁর চরিত্রের স্বকীয়ত্ব। এই 'আমি' নির্জ্ঞান-স্তরে পথ হাঁটার

সময় প্রায়শ হয় 'আমরা'— যুথবদ্ধ আমরা তাঁর কবিতায় মিথচেতনার উৎসকালের সম্মিলিত মানবচিত্ত-ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বিশ শতকীয় দৃষ্টিকোণে সন্ধান করেন সমস্ত ব্যক্তিমানুষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ব্যক্তি-আমির নির্ভরতা, যেমন করে মিথকাঠামো ব্যক্তিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছিল সমষ্টির সঙ্গে। অবশ্য জীবনানন্দ রয়ে যান তাঁর নিজের অস্থির যুগপরিস্থিতির মধ্যে, আত্মহত্যার তীব্রবাসনা তাঁকে প্রলুব্ধ করে, বাস্তবতার রক্তপাত-পতন-পচন তাঁকে করে অবসন্ন, তবুও তিনি সমাবৃত হন মানবপ্রাণীকুলের সঙ্গে নক্ষত্ররাজির অনন্তপটে; বিনষ্টি সত্ত্বেও মরণশীল সৌন্দর্যের বেদনা আর গভীর হৃদয়বত্তায় গঠিত হয় তাঁর কাব্যাত্মা। দ্বন্দ্বভোগের সূত্রেও তিনি কেবল একালীন জীবনযন্ত্রণায় নিগৃহীত নন, তাঁর কাছে মানব অস্তিত্বের 'ক্রাইসিস' চিরকালীন বিষয়। মিথকাল থেকেই মানুষ অস্তিত্ব-সংকটগ্রস্ত, নির্যাতন ভোগকারী— আমরা সবাই 'বেদনার সন্তানের সন্তান'। কালধৃত তত্ত্ব-প্রতর্ক-এসব সংকট ও নির্যাতনকে আরও বিস্রস্ত ও বিস্তৃত করে মাত্র। তাই জীবনানন্দের বিশ্ববীক্ষার প্রথম শর্ত নীরবতায় মগ্নতা, নির্জনতায় বিচরণ; তত্ত্ববিহীন 'ভিশন'-কে অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ নির্জনতার দ্বারাই অনুশীলিত। ব্যক্তির কামনাবাসনার বৃত্ত ছাড়িয়ে বহুকালের প্রত্নস্মৃতি—যা রয়ে যায় বিধ্বংসী সভ্যতার অবতলে তার উদঘাটনে তিনি এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, পুরাণের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন, সর্বদাই অব্যবহিত এবং নীরবতায় লালিত। অতীতের 'বহু-আমি'র সঙ্গে একীকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর পরাচৈতন্য পেয়ে যায় সময়চেতনার তাৎপর্য-সূত্রটি। তাঁর কাছে সমগ্র অতীত বর্তমানের মতই প্রাণবন্ত—রঙে-রেখায়-ইন্দ্রিয়বেদ্যতায় জীবিত অথবা বর্তমানে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার অস্তিত্ব যেন অতীতসত্তার দ্বারা অন্তর্গঠিত—অতীতই গড়ে রেখেছে বর্তমানের স্বরূপ। পূর্বকালের প্রত্নপতিমা একালের প্রতিমার বহু মুখচ্ছবিতে একাকার হয়, শঙ্খমালা-চাঁদচম্পা-বেহুলা-মিশরীয় নর্তকী-ব্যবিলনের রানি—সকলে পাড়াগাঁর রমনী-শরীরে অবলীন, অথবা আজকের রমনীটি প্রত্নযুগের নারীসত্তায় প্রোথিত। এরই সারীভূত চিত্রকল্প বনলতা সেন—সর্বসময়ে স্পর্শযোগ্য, আরাধ্য ও পরমাশ্রয়-রূপে কাম্য। একালের চিতাগ্নিতে তিনি প্রজ্বলিত করেন সেকালের শঙ্খমালাদের, হংকয়ের তূণের উপরে দেখেন নৃত্যরতা বিশাল খোপার প্রতিচ্ছায়া— যেন আদিকাল থেকে চলছে এই ক্রন্দন-নৃত্য-নীরবতার চক্র। অতিক্রান্ত সময়কে স্থিরবদ্ধ করার এরকম প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনানন্দ সাম্প্রতিক কালখন্ডকে দ্রবীভূত করে ফেলেন। মিথপ্রকরণ তাই তাঁর কবিতায় অনিবার্য পদ্ধতি।

প্রকৃতি চেতনার-সূত্রে সময় ও ইতিহাসচেতনার স্বরূপ গঠিত, আর তাতে দ্যোতক হিসেবে থাকে মিথচারিতা। ইতিহাস ধরে রাখে মিথের হারিয়ে-ফেলা উপাদানরাশি থেকে নিষ্কাশিত তাৎপর্য, নিজের কালে সংঘটিত ঘটনার অনেকান্ত অর্থকে ইতিহাস মিথঘটনার অবিনশ্বর মাত্রায় ব্যাখ্যা করে। জীবনানন্দের ইতিহাস বিষয়ক ধারণার স্বকীয়ত্ব হল তিনি মিথকাহিনী থেকে বহু প্রত্যয় ও সদৃশ-প্রতিমাকে চয়ন করেন, কখনও-বা ইতিহাস্‌কেই দেন মিথলজির অন্বয়। শতাব্দীকালের ঘটনা ও মনীষা তাঁর কাছে শতশত শতাব্দীর ঘটনা-মনীষার স্মারক, মিথই যেন ইতিহাসের ধারায় পুনঃপুন উজ্জীবিত হয়। অন্তত, মিথের রয়েছে সেই বার্তা যা যে-কোন কাল ও ঘটনার চিহ্নবাহী। কবির ভাষায় এ হল 'আলোকবর্তিকা'— ভবিষ্যৎ-মানবদের জন্য অতীতের রেখে-যাওয়া চিরভাস্বর দীপশিখা। পৃথিবীর সব প্রদীপ ত্যাগ করে জীবনানন্দ তাই আসেন এই দীপালোকের কাছে, পৃথিবীর সব জল ছেড়ে আসেন অন্য-এক জলের কাছে। তাঁর সচেতন উক্তি;

*মহাভারত থেকে গল্পরূপক টেনে এনে আজকের শতাব্দীকে আলোকিত করতে চেষ্টা করতে পারি আমরা, করা হয়েছে করা হবে কিন্তু তা অগ্নিসংস্কারের মতো আধুনিকতাকে নিজের সত্তায় ও সম্ভাবনায় বিশুদ্ধ করে নেবার জন্য ...। মহাভারতকে একটা অবিস্মরণীয় উৎস হিসাবে অনুভব করি আমরা, কিন্তু সময়ের সেতু পার হতে চাই তারি ভিতর থেকে উৎসারিত আমাদের শতাব্দীর এবং জীবনের প্রয়োজনে স্থিরতর আধুনিকের অপরিহার্য সব সম্বন্ধশৃঙ্খলার পথে।*

মিথবিশ্বের অনুরূপ তাঁর কাব্যলোকে রয়েছে সম্বন্ধশৃঙ্খলায় গ্রন্থিবদ্ধ একই সময়ের বিচিত্র উৎসারণধৃত ত্রয়ীলোকের অস্তিত্ব—শাশ্বতলোক, ব্যাপ্তলোক ও অন্তর্লোক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিরতর মহাসময় শাশ্বতলোকে বিরাজিত—যা দিগন্তবদ্ধ নয়, সময়ের অবিনশ্বর-উৎসরূপেই এর অধিষ্ঠান। ব্যাপ্তলোকের মধ্যে তিনি দেখেন অনিবার্য মৃত্যুর আধিপত্য আর পুনরুজ্জীবনের রূপক—যা রয়েছে প্রকৃতি ও মানবসমাজের দ্বৈত-অস্তিত্বে বদ্ধ কালচক্রের মধ্যে। নশ্বরতা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের, প্রেমের ধূসর-নীলাভ আলো-অন্ধকারে এজগৎ রহস্যময়, কুহেলিকাচ্ছন্ন। অন্তর্লোকে আছে সুগভীর ক্লান্তি-অসুখ-অনন্বয়বোধ—এখানে কবির আত্মা অন্ধকারেই লালিত, একে বলা যেতে পারে বর্তমানকালের বস্তুবিশ্বের অভিঘাত-উত্থিত অ্যাবসার্ডিটি। এরকম প্যাটার্ন কবিকে পুরাণ থেকে ইতিহাসে, ইতিহাস থেকে ভূগোলে, ভূগোল

থেকে প্রকৃতিতে বিচরণের সেতু গড়ে দেয়। জীবনানন্দের ইতিহাস-ভূগোল-প্রকৃতি পরিভ্রমণ মিথানুষঙ্গে অন্তর্দীপ্ত, এরই আলোকে তাঁর নিঃসঙ্গ পথহাঁটা, সমুদ্রে নাবিকীবৃত্তি, নক্ষত্রবিহার—জলস্থল আকাশব্যাপী বিচরণ হয়ে ওঠে অন্যরকম স্বপ্নধ্যানের দ্যোতক। স্বপ্ন বহন করে স্মৃতিপুঞ্জের আর্কেটাইপ, ধ্যান ব্যবহার করে অন্তর্দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়স্পর্শ দিয়ে উন্মিলিত হয় সৃজনীবৃত্তির সূক্ষ্মতম প্রকাশ। মানব মস্তিষ্ক চেতনালাভের প্রাথমিক যুগেই এভাবে স্মৃতি-স্বপ্ন-ধ্যান ব্যবহারের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল—মিথপদ্ধতি তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ।

মিথ-প্রক্রিয়ার সূত্র থেকে কবির প্রকরণে গৃহীত হয় ন্যারেটিভ পদ্ধতির ব্যবহার। মিথের কায়া সৃষ্টি হত বর্ণনার রীতিতে, প্রতীক-রূপকের অর্থ এখানে মুখ্য। পাখি-বৃক্ষ-জন্তু-জড়বস্তু এখানে কথক, বর্ণনাকার। তারা বিশ্বজাগতিকতার তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা, ঘটনার তাৎপর্য নির্দেশক, ভবিষ্যৎ-কথনের দ্রষ্টা। এটা অলৌকিকতা, কিন্তু সূত্রটির মূলকথা হল জড় ও মানুষ একই ব্যাপ্ত নিয়মের অধীনে অস্তিত্বশীল, বিনাশশীলও বটে। তাঁর কবিতায় কথনরীতির উক্ত আদি অভিজ্ঞতাটি— যা রয়েছে আমাদের লোকজ শিল্পরীতিতে বহমান এবং কার্যকর এক প্রকাশকলা হিসেবে গুপ্ত, জীবনানন্দ তার উদ্ধরণ ঘটান। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকেই তিনি এক কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, বর্ণনার কাঠামোয় তাঁর কবিতাদেহ কিছু রীতিনীতির ভিন্ন পরিচর্যা করে। এর একটি কৌশল হল ক্রিয়াপদে ঘটনাকে অতীতকালের অর্থ দেওয়া, অজস্র পুনরাবৃত্তধর্মী বাক্য ব্যবহার, হেঁয়ালি-কথার প্রয়োগ, ড্যাসচিহ্নের স্পেসে কথার নিশ্চলতাকে থমকে দেওয়া। মিথকাহিনীর মধ্যে জড়ো করা হত কল্পনার সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাহীন, অচিহ্নিত এক মেঘমালার বিস্তার, গল্প তার ঘটনাক্রিয়াকে উত্তীর্ণ করে দিত সময়-আয়তনের ওপারে, একইসঙ্গে রচিত হত শিথিল-মন্থর এক চলমানতা, যা বিস্ময়-শিহরণ দ্বারা প্রতিমুহূর্তে চকিত, ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়ের আকস্মিক যোগাযোগে অলৌকিক এবং নাটকীয়। কবিতার ফর্মে বর্ণনার দীর্ঘপ্রবাহ আর নিশ্চলতার বিস্ময়াবেগ সঞ্চারের দক্ষতায় এই কবির কাব্যদেহ ভিন্নধর্মী, আধুনিক কাব্যরীতির উল্লম্ফন-উল্লিখন-মন্তাজ-মহাকাব্যিক জঙ্গমতা ইত্যাদি চমকপ্রদ শৈলী তিনি গ্রহণ করেন না, মিথের বর্ণনারীতি, পুনরাবৃত্তধর্মী কথন ও নিশ্চলতার ফর্মই তাঁর প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে সঞ্জীবিত হয় সজীব, স্পর্শযোগ্য রঙ-রূপের ক্রীড়া, ইন্দ্রিয়ানুভবের তীক্ষ্ণতম স্তরে এর অবাধ বিচরণ। তাঁর কবিতা এ-সূত্রেই 'চিত্ররূপময়', দৃশ্যানুভূতির স্থানবর্ণিমায় অপরূপ এবং স্বভাবতই ইম্প্রেশনিস্টিক দৃষ্টির অনুশীলনকারী। আবার ক্লান্তি-ভয়-

নৈরাশ্য-ব্যর্থতার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিক-মনের নির্জ্ঞান স্বরূপটি প্রতীকায়িত করেন বলে জীবনানন্দ সাররিয়ালিস্টিক, কথনও-বা অবস্কিউর, তাঁর সাররিয়ালিজমের অধিকাংশ অনুষঙ্গ মিথউপাদানে গড়া, মিথলোকের আবহ ও প্রতিমা কবিতায় সৃষ্টি করে পরাচৈতন্যের প্রতীতিগ্রাহ্য মায়া।

কিন্তু, ইম্প্রেশনিজম বা সাররিয়ালিজম-চর্চার সচেতন উদ্দেশ্যের মধ্যে তাঁর কাব্যশৈলী নিবিষ্ট নয়, তাঁর অবলম্বিত রীতির লক্ষ্য হল স্থিরতর ধ্রুবকের নির্মাণ, যেখানে প্রত্নস্মৃতির মগ্ন-উত্তরাধিকার মৌলিক রূপরীতি নিয়ে হতে পারে বিকচ, প্রত্যয়ীভূত : সভ্যতার রাক্ষসীবেলায় বেঁচে থেকেও তিনি স্পন্দিত হন মহাবিশ্বলোকের ইশারায়, আর তাই ইউরো-আধুনিকতার রীতিনীতির বাইরে তাঁর মধ্যে জাগে দেশজরীতির অনুসন্ধান-স্পৃহা। আমাদের তথাকথিত রেনেসাঁ, এনলাইটমেন্ট বা অর্ধবুর্জোয়া বিকাশের ধারায় দেশজমিথের বহমানরূপের জগতে তাঁর আত্মনিমজ্জন অনেকবেশি স্বস্থ ও যথাযথ। আশ্চর্যভাবে তিনি অস্বীকার করেন দর্শনেরও তত্ত্বভিত্তি—মূলতই তিনি অ্যান্টি-ম্যাটাফিজিকাল। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-মাধ্যমই কবিকে জীবনপ্রবাহ-লগ্ন করে— এ-জীবনের বাইরে তাঁর কোনই অবস্থান নেই, জীবনের জলে তিনি অবিরাম স্নাত, জীবনলগ্ন সুচেতন এক আদিঅদিতই তাঁর অভীষ্ট। অতীতের স্মৃতি আর বর্তমানের মেধাবী-স্বরূপের বলয়ে এই আদিআদিতির চলাচল বলেই জীবনানন্দের কবিতায় শেষ পর্যন্ত এক হৃত-সৌন্দর্যের 'বিষন্নলোকী আলো' বিচ্ছুরিত থাকে। আমাদের শ্রীহীন শতাব্দীর প্রখর বৌদ্ধিক মুখচ্ছবি ঐসব স্মৃতির অনুবন্ধনে হয়ে ওঠে নীল-হরিদ্রাভ এক আভা—স্বপ্ন ও বিষন্নতার অপরূপ মিশ্রণে তার দেহকায়া বিভাময় ও পরিশুদ্ধ।

একাকিত্ব ও যৌথতা, আমি ও আমরা, আধুনিকতা ও চিরন্তনত্ব, কালসন্ধি ও মহাসময়, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন—এসবই তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করে দ্বি-শীর্ষ। এই বিশ্বপ্রকৃতিতেই রয়েছে দ্বি-শীর্ষ, এ-এক ব্যাপ্ত নিয়ম—যার অধীনে সবকিছু থাকে নিয়ন্ত্রিত-রূপের মধ্যে বদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কসমিক-সত্তার যে অদ্বৈতরূপ, তা নেই জীবনানন্দে, দ্বৈতত্ব নিয়েই তিনি সংবদ্ধ করেন নিসর্গ-সমাজ-মানব-ইতিহাস-সময়, চৈতন্যের সর্ববিধ ভাঙন সত্ত্বেও, গুহাগহ্বর সত্ত্বেও শুভবোধের আবহমান পাখির প্রতীক তাঁর হাতে ধরা দেয়, মিথবাহিত অনিঃশেষ, অনন্ত শুভের উৎসই তাঁকে দেয় প্রত্যয় ও উত্তরণের নির্দেশ। যত বেশি প্রত্নস্মৃতির মধ্যে সংগুপ্ত মহৎ মানবিকতা শিল্পের আঙ্গিকে সত্য হবে, উত্তরণের শক্তি ততবেশি প্রাঞ্জলতা লাভ করে, কারণ অভিজ্ঞতাই জীবনের মহার্ঘ অর্জন, আদিঅভিজ্ঞতা আরও বেশি দিক-

নির্দেশক। মিথস্মৃতির চেতনা তাঁর সৃজনীবৃত্তিতে মানব-প্রজ্ঞার সংস্পর্শে যাওয়ার গতিমুখকে উন্মোচিত করতে পেরেছে বলেই মনে হয়, উক্ত সৃজনীশক্তি প্রতীক-উপমা-চিত্রকল্প ও ছন্দে কী-রূপে প্রকাশিত হয়েছে সে আলোচনা আরও ব্যাপক ও অভিনব— যা এ-প্রবন্ধের পরিসরে অনালোচিত রয়ে গেল।

**গ্রন্থপঞ্জি**


| | | |
|---|---|---|
| ১ | জীবনানন্দ দাশ<br>১৩৭৯ | *কবিতার কথা,* কলকাতা, ৩য় সংস্করণ। |
| ২ | অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ<br>১৯৯১ | *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি,* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। |
| ৩ | *নৃ* (পত্রিকা) | ২য় সংকলন, মিথ সংখ্যা, ঢাকা।<br>বৈশাখ ১৩৯৯ |
| ৪ | শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদক)<br>১৯৯৬ | *এই সময় ও জীবনানন্দ*<br>সাহিত্য অকাদেমি<br>কলকাতা |
| ৫ | Maud Bodkin<br>1934 | *Arcetypal Patterns in Poetry*,<br>Oxford University Press, London. |
| ৬ | Roland Barthes<br>1986 | *Mythologies*<br>Glasgow. |